সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি

মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি

মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

প্রকাশকের কথা

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র'র প্রথম কেন্দ্রীয় কর্মশালা ও শিক্ষাশিবির গত ১১ ও ১২ জুন ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। এই দু'দিনই ২য় সেশনে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী।

আমরা মনে করি, একটি দেশে জীবনের সকল ক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে একটি ব্যাপক সাংস্কৃতিক আন্দোলন কখনও সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তি তথা মানবমুক্তির আদর্শ মার্কসবাাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার চর্চা ব্যতিরেকে গড়ে উঠতে পারে না। আর এ জন্য সর্বহারা শ্রেণীর সঠিক বিপ্লবী দলের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। এ সংগ্রাম কীভাবে পরিচালিত হবে, কীভাবে সবগুলো ক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের চিন্তাভাবনা-রুচি-সংস্কৃতির বিপরীতে বিকাশমান সর্বহারা শ্রেণীর রুচি-সংস্কৃতি-চিন্তাচেতনা প্রতিষ্ঠিত করা যাবে- এ নিয়ে কমরেড সাধারণ সম্পাদক সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেন।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত কর্মীদের জন্য এ আলোচনাটা শিক্ষণীয়। তাই, আমরা তাঁর এই বক্তব্যটিকে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করলাম।

ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য সোমা
ইন্‌চার্জ
চারণ সাস্কৃতিক কেন্দ্র

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি

কমরেড সভাপতি, পার্টির কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির নেতৃবৃন্দ, সারাদেশ থেকে আসা চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রতিনিধিবৃন্দ,

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে উৎসাহী কমরেডরা এখানে সমবেত হয়েছেন। এদের কেউ কেউ পারফর্মিং আর্টে কিছুটা অংশ নিতে পারেন, সবাই নন। সবাই যে পারফর্মার হবে তা নয়, অনেকেই সংগঠক হিসেবে থাকবে, শলা-পরামর্শ দেয়ার জন্য থাকবে। আমরা দলের বিভিন্ন ফ্রন্টে যখন কাজ করি তখন কিছু মানুষের বিশেষ ধরণের পেশা, বিশেষ ধরনের শ্রেণী অবস্থানকে কেন্দ্র করেই মূলত কাজটা করি। এসব জায়গায় ঘুরতে গিয়েও আমরা কিছু মানুষ পাবো যারা এই ক্ষেত্রটিতে উৎসাহী। তাদেরকেও তখন আমরা এ ক্ষেত্রে যুক্ত করবো। ফলে অন্য সকল ফ্রন্টের কাজের সাথে এই ফ্রন্টের কাজ বিরোধাত্মক নয়, বরং ঠিকভাবে বুঝলে সব জায়গা থেকেই আমরা কিছু লোক বের করতে পারবো।

এই কথাটা আমি শুরু করলাম এই কারণে যে, আমাদের দলে কর্মী সংখ্যা এমনিতেই কম। সারাদেশের তুলনায় আমাদের দল খুবই ছোট। ফলে একজনকেই অনেক কাজ করতে হয়। এখানে উপস্থিত চারণের অনেক কর্মীই একাধিক ফ্রন্টের সাথে যুক্ত। তাই স্বাভাবিকভাবেই এখানে একটা প্রশ্ন এসেছে যে, একজন কর্মী এতগুলো কাজ ঠিকভাবে সমন্বয় করতে পারবে কি'না এবং একজনকে এতগুলো কাজে লাগানো ঠিক কি'না?

আমি আমার শুরুর কথার সাথে এটাও যোগ করতে চাই যে, প্রতিটি ক্ষেত্রের আন্দোলন একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কিত। এটি না বুঝে, একটির সাথে আরেকটির সংযোগ সাধন না করে যদি আমরা আংশিকভাবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিরাট কিছু করে ফেলতে চাই তাহলে সামগ্রিক সামাজিক পরিবর্তনে নিজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমরা রাখতে পারবনা।

কোনো মানুষের যদি দশটি কাজ থাকে তাহলে দশটি কাজই তার কাছে সমান হয় না। এর মধ্যে প্রধান কাজ কোনটি? এটি কে নির্ধারণ করে? যে সামাজিক সংগ্রাম থেকে কাজের প্রয়োজন সৃষ্টি হয়েছে সেই সামাজিক প্রয়োজন থেকেই তা নির্ধারিত

হয়। কিন্তু প্রত্যেকটিই দরকার। এটি না বুঝলে এই দরকারের ক্ষেত্রে আমার যে ভূমিকা সেটি যথার্থভাবে পার্টি আদায় করতে পারবে না। ছাত্র ফ্রন্ট যারা করে তারা কি নারীদের সংগঠনে ভূমিকা রাখতে পারবে না? পারবে। একজন ছাত্র ফ্রন্টের সংগঠক যেমন ছাত্রদের দাবি-দাওয়া, অধিকার ইত্যাদি নিয়ে লড়াই করবে, তেমনি যে প্রতিষ্ঠানে সে কাজ করে সেখানে নারীদের বিভিন্ন সমস্যা-সংকটকেও সে তুলে ধরবে। কিন্তু বাস্তবেই তা করবে কি না তা নির্ভর করে নারীদের অপমান-অবমাননা, তাদের উপর নির্যাতন - সেটি সে কতখানি নিজে বুঝে অন্যের মধ্যে তা সঞ্চারিত করতে পারে। অর্থাৎ আমি নিজে কতটা ব্যথা-বেদনা তৈরি করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অন্যকে যুক্ত করতে পারি। আবার যেহেতু একজনের দুই-তিন এমনকি চারটে কাজও থাকে, সেহেতু একটির সাথে আরেকটির কনট্রাডিকশন (দ্বন্দ্ব) হয়, তখন ঠিক করতে হয় তখনকার সময়ে কোনটি প্রায়র, কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এসবের সোশ্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং (সামাজিক প্রয়োজনবোধ) না থাকলে নিজের মনমতো ওপিনিয়ন (মতামত) দেবেন। এটি চিন্তার গণ্ডগোল। এরকম হা হুতাশ যারা করতে থাকেন তারা আসলে বিপ্লবী রাজনীতির যে মাহাত্ম্য, যে সৌন্দর্য, তার যে রসবোধ, যে হৃদয়বৃত্তি - তার খোঁজই পাননি। যে মানুষ উচ্চ মানবিকতায়, মূল্যবোধে উজ্জীবিত - তার কাজের আবার ফর্মা বাঁধা থাকে নাকি? যাকে যেখানে পাবে, যেভাবে, যে প্রক্রিয়ায় তাকে বিপ্লবের কথা বুঝানো যায় - একজন বিপ্লবী সবসময় সেই চেষ্টাই করবে। ধরা যাক একজন আইনজীবীকে সে পেলো, তাকে সে তখন আইনের যে অসামঞ্জস্যতা অর্থাৎ কনট্রাডিকশন অব জুরিস্প্রুডেন্স বুঝাবে। একজন বিজ্ঞানীকে পেলে সে বিজ্ঞানের যে ক্রাইসিস (সংকট) সেটি বুঝাবে। বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটছে না। বিজ্ঞানকে পুঁজিবাদ তার মুনাফার বৃত্তে আটকে রেখেছে। বিজ্ঞানের মুক্তির জন্যে সে বিজ্ঞানীদের উদ্বুদ্ধ করবে।

তাহলে কমরেড, উপলব্ধি খুব ইম্পর্টেন্ট (গুরুত্বপূর্ণ)। একজন রাজনীতি সচেতন কমরেডকে বিপ্লবী রাজনীতির সার্বিক নেসেসিটিকে (প্রয়োজনকে) বুঝতে হবে। আপনারা সেভাবেই বিষয়টিকে দেখবেন। আমি আর এ ব্যাপারে কথা বাড়াবো না।

আমি যেটা বলতে চাই তা হলো শুধু অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া নয়; সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, মননের ক্ষেত্রে, মানবিকতা-মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যে কষ্ট-দুঃখ এগুলো দিয়েও মানুষকে উজ্জীবিত করা যায়। মানুষকে দেখাতে হবে, আপনার যে মানসিক কষ্ট তা কোথা থেকে সৃষ্টি হলো? আপনি কি মানসিক কষ্টের মধ্যেই জন্মেছেন? তা যদি না হয় তাহলে জন্মাবার পরবর্তীতে আপনার যে মানসিক যন্ত্রণা সেটি কিন্তু সামাজিক কারণ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, আমাদের দেশটা সকল দিক থেকেই

একটা শ্রেণীবিভক্ত দেশ। এটি বুর্জোয়া ও সর্বহারা শ্রেণী অর্থাৎ শোষক ও শোষিত শ্রেণী - এই দুইভাগে বিভাজিত। আমরা জানি বা না জানি পরস্পরবিরোধী দুটি শ্রেণীর লড়াই গোটা সমাজের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে চলছে। সমাজ অভ্যন্তরে 'অবজেক্টিভ ল' (চেতনানিরপেক্ষ নিয়ম) হিসেবেই তা চালু আছে। শোষক শ্রেণী জনগণকে তার আধিপত্যের মধ্যে রাখতে চায়। এজন্যে জীবনের যতক্ষেত্রে মানুষের অবস্থান আছে, সকল ক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে তার চিন্তাধারা আছে। তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থ রক্ষাকারী রুচি-সংস্কৃতি, ভালবাসা, স্নেহ, মমতা, শ্রদ্ধা এগুলি তৈরি করেছে অর্থাৎ শোষক বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থভিত্তিক যে সামাজিক ব্যবস্থা তার প্রয়োজনীয় ভাবাদর্শ তারা তৈরি করেছে। সকল মানুষ, সে জানুক বা না জানুক এই ভাবাদর্শগত কর্তৃত্ব ও আধিপত্যে বিরাজ করে। অর্থাৎ সে যা দেখে ভালবাসে, যা দেখে স্নেহ-মমতা প্রকাশ করে, যা দেখে শ্রদ্ধা-সম্মান দেয়- তার পুরো কাঠামোটিই, এই সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে শোষকশ্রেণী যে ভাবগত পরিমণ্ডলটি তৈরি করেছে তার ভেতরে অবস্থান করে।

আমরা এখানে যারা মিলিত হয়েছি, আমাদের মধ্যেও তার প্রভাব আছে। কারণ আমরা এ সমাজেই বাস করি। আমাদের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে পেটিবুর্জোয়া অর্থাৎ ক্ষুদ্র বুর্জোয়া হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে। এটি অতীতের ক্ষুদ্র মালিকানার সাথে সম্পর্কিত। আবার গ্রাম ও শহরে আমরা যাদের নিয়ে লড়ি, তাদের মধ্যে আছে গ্রামের দরিদ্র চাষী ও ভূমিহীন সর্বহারা আর শহরে কল-কারখানাভিত্তিক সর্বহারা শ্রমিক। এদের মধ্যেও অতীত সমাজের নানারকম শ্রেণীগত, রুচিগত, সংস্কৃতিগত সংযোগ আছে, তার রেশ আছে। এইভাবে সমাজের পেটিবুর্জোয়া অংশ, গ্রামের দরিদ্র চাষী ও ভূমিহীন সর্বহারা এবং শহরের সর্বহারা শ্রমিক- এই সমস্তটা মিলে আমরা যে একটা বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা করছি, তাতে আমরা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার ভাবাদর্শগত পরিমণ্ডল ত্যাগ করে এই বিরাট, বিশাল বিপ্লবী সংগ্রামের পরিপূরক ভাবাদর্শ গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। অর্থাৎ নতুন সমাজের নতুন চিন্তা, তার রুচি-সংস্কৃতি, তার নীতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ভালবাসা, স্নেহ, মমতা ইত্যাদি সৃষ্টি করার লক্ষ্যে একটা বিকল্প জীবন গড়ে তোলার লড়াই আমরা করছি। এই বিরাট জীবনের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত ক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে এই লক্ষ্যেই আমরা সংগ্রাম পরিচালনা করছি।

এই মহাসংগ্রামে বুর্জোয়া শ্রেণীকে উৎখাত করার জন্য, তার চিন্তাধারার বিপরীতে মানুষের মনোজগতে বিপ্লবের চিন্তা ক্রিয়া করার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, "বিপ্লবের সমস্ত আয়োজনের সঙ্গে বিপ্লবের মানসিক প্রস্তুতির দিকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই মানসিক প্রস্তুতির বিষয়টি সংস্কৃতির সঙ্গে, নীতি-নৈতিকতার সঙ্গে সরাসরি জড়িত।" এই সংগ্রামে সাংস্কৃতিক

সংগঠনের দরকার কী? দরকার এই জন্য যে, প্রতিটি শ্রেণীর নিজস্ব ভাবধারাকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টির জন্য নিজস্ব সংগঠন দরকার। বুর্জোয়া ব্যবস্থার যত প্রভাব, যত রকমভাবে মানুষের আবেগের উপর তার ক্রিয়া করার ক্ষমতা আছে, তার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সর্বহারা শ্রেণীর ক্রিয়া করার সামর্থ অর্জন করতে হবে। বুর্জোয়াদের এরকম সংগঠন প্রচুর আছে। মধ্যবিত্ত পেটিবুর্জোয়াদেরও আছে। কিন্তু সর্বহারা শ্রেণীর চিন্তা ধারণ করার মতো সংগঠন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এদেশে নেই। কারণ সর্বহারা শ্রেণীর এরকম সাংস্কৃতিক সংগঠন সর্বহারা শ্রেণীর পার্টি ব্যতিরেকে, তার ভাবগত পরিমণ্ডলে অবস্থান করা ব্যতিরেকে, সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তির লড়াইয়ে অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রামে নানাভাবে অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে গড়ে উঠতে পারে না। চারণকে আমরা সেই সংগঠনরূপে দাঁড় করাতে চাই।

তাই এটা অন্য যে কোনো ফ্রন্টের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। এটার লক্ষ্যও শ্রেণী উদ্দেশ্য ও শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করা। অন্যান্য গণসংগঠনের সাথে তার মূল দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পার্থক্য নেই, শুধু 'ফর্ম অব এ্যাকটিভিটির' (কাজের ধরনের) পার্থক্য আছে।

কমরেড, যুগে যুগে যারাই সমাজকে পরিবর্তন করতে চেয়েছে, তাকে আরও উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে চেয়েছে, তাদেরকে সেই উন্নত চিন্তাভাবনার পরিপূরক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়েছে। বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা মধ্যযুগীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে ব্যক্তির মুক্তি, ব্যক্তির স্বাধীনতা এই সকল চিন্তা সমাজে নিয়ে এসেছিলো। কারণ সামন্ত সমাজে ব্যক্তি সামন্ত জবরদস্তির কাছে পুরোপুরি বন্দী ছিলো। সেই ব্যক্তির নিজের স্বাতন্ত্র্য, পছন্দের স্বাধীনতা, ভালবাসার স্বাধীনতা, ব্যক্তিগতভাবে সম্পত্তি ধারণের স্বাধীনতা - ইত্যাদি বিষয়গুলোতে তার অধিকারের কথা বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা নিয়ে আসলো। সামন্ত খবরদারিতে বন্দী মানুষ এরকম করে জীবনকে ভাবতও না। বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা তাদের এই সকল জিনিসের খবর দিলো। সে তখন জীবনের আরেক রূপ দেখলো। সেদিন বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা মানুষকে ভালবাসার জন্য কাঁদিয়েছে। সামন্ত সমাজে নারী-পুরুষ নিজেদের পছন্দের ভিত্তিতে পরস্পর সম্পর্কিত হতে পারতো না, বাধা ছিলো। বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা সাহিত্য সৃষ্টি করে সেই বাধা সম্পর্কে তার মধ্যে ব্যথা, বেদনা, কষ্ট নিয়ে আসলো। তাকে বিয়োগান্তক রূপ দিয়ে, বিচ্ছেদের বেদনা সৃষ্টি করে, মানুষের মধ্যে যন্ত্রণা তৈরি করে সেই সামাজিক ব্যবস্থাকে পাল্টাবার সংগ্রাম করলো। এই কারণেই মানুষের সভ্যতা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে রেনেসাঁর ভূমিকা বিরাট। রেনেসাঁ মানুষের মধ্যে 'ফ্রিডম অব চয়েজ' (পছন্দের স্বাধীনতা) এর ধারণা নিয়ে এলো। এই প্রশ্নে বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা যখন লড়লো, সেটা তখন সে তার ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য লড়েনি। সেটা আজকের 'ফ্রিডম অব চয়েজ' দিয়ে বোঝা যাবে না। আজকের 'ফ্রিডম অব চয়েজ' একটা

সুবিধাবাদ। কিন্তু সেদিন সেটা ছিলো একটা সামাজিক প্রয়োজন। সেদিনের প্রেমে ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছিল ঠিক, কিন্তু সামাজিক বাধার বিরুদ্ধেও তাকে লড়তে হয়েছে। অর্থাৎ সামাজিকভাবে মানুষের এই অধিকার দরকার, এটা প্রতিষ্ঠার জন্যও তাকে লড়াই করতে হয়েছে। সামন্ত স্বৈরাচারী শাসনের মধ্যে যেহেতু পছন্দের স্বাধীনতা ছিল না, তাই সেদিন সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তিগত পছন্দের স্বাধীনতা অর্জন অভিন্ন অবস্থানে ছিলো। সামাজিক প্রয়োজন আর ব্যক্তিগত সুবিধা - এ দু'য়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। এটাকে বুঝতে হবে।

বুর্জোয়া মানবতাবাদের উত্থানকালে তাই গোটা বিশ্বে যত সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এর সমস্তই মানুষকে কাঁদানোর জন্যে। মানুষের মধ্যে অপ্রাপ্তির ব্যথা জাগিয়ে তোলার জন্য। তার যে অভাব, যে যন্ত্রণা, তাকে সাহিত্যের মাধ্যমে উন্নত শিল্প ও শৈলীতে বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা প্রকাশ করেছে। আমরা শেক্সপিয়রের রোমিও-জুলিয়েট পড়লে দেখবো, রোমিও ও জুলিয়েট দুই আলাদা সামাজিক-পারিবারিক অবস্থানের মানুষ হওয়ার কারণে তাদের মিলনে সামাজিক বাধা ছিলো। কিন্তু 'ফ্রিডম অব চয়েজ' এর জন্য লড়াই করতে গিয়ে তারা প্রাণ দিলো। কেন দিলো? তারা নবীন যুবক-যুবতী, পরস্পরকে ভালবেসেছে। কারণ জাতপাত ইত্যাদির ঊর্ধ্বে উঠে পরস্পরকে ভালবাসার সামাজিক আকাঙ্ক্ষা তখন তৈরি হয়েছে। সমাজচিন্তাকে ব্যক্তি বিশেষীকৃতভাবে ধারণ করে। সামাজিক যে আকাঙ্ক্ষা, যে দুঃখ, যে কষ্ট, যে বঞ্চনা - ব্যক্তি তাকে ধারণ করে, তাকে প্রকাশ করে। তখন পুরনো সমাজ কর্তৃত্ব করতে আসলে সে রুখে দাঁড়ায়। রোমিও-জুলিয়েটও এই বিদ্রোহ করতে গিয়ে জীবন দিলো। কেবলই ব্যক্তিগত কারণে জীবন দেয়নি। শেক্সপিয়র এই দুটি সুকোমল যুবক-যুবতীকে বিচ্ছেদের বেদনায় বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে সমাজের মধ্যে ব্যথা সৃষ্টি করতে চাইলেন। দেখাতে চাইলেন যে খুবই স্বাভাবিক-সাবলীল মানবিক অধিকার থেকে সমাজ তাদের বঞ্চিত করছে। বলতে চাইলেন যে, দেখো, তোমাদের সমাজ কত অকার্যকরী হয়ে গেছে, এ দিয়ে আর চলবে না, নতুন সমাজ লাগবে।

এই বুর্জোয়ারা 'ফ্রিডম অব চয়েজ' এর সাথে সাথে সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকারের কথাও আনলো, যাকে আমরা 'ইন্ডিভিজুয়াল রাইট টু প্রপার্টি' বলি। এই মালিকানার ধারণা পূর্বের সকল সমাজের মালিকানার ধারণা থেকে পৃথক। কারণ সামন্ত সমাজে ভূমিদাসদের সম্পত্তির উপর মালিকানা ছিল না। সম্পত্তি ছিলো ভূস্বামীর। সে তার কাজ করে জীবন চালাতো। কিন্তু বুর্জোয়ারাই প্রথম সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা নিয়ে এলো, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চিন্তা নিয়ে এলো।

সেটা রেনেসাঁর সময়, যখন বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থা যখন বুর্জোয়াদের কর্তৃত্বে এলো, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যখন

সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন সে ব্যক্তি মালিকের সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবেই এলো। তখন শ্রমিক সমাজের প্রয়োজনেই উৎপাদন করে, কিন্তু তার ফল ব্যক্তি মালিক আত্মসাৎ করে। অর্থাৎ শ্রমের চরিত্র সামাজিক, কিন্তু মালিকানা ব্যক্তিগত। জনাকয়েক পুঁজির মালিক ছাড়া বাকি সবাই নিঃস্ব, সর্বহারা। শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিমালিকানা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের লড়াইয়ের এই হলো পরিণতি। সামন্ত সমাজের ভূমিদাসত্ব থেকে মানুষ মুক্ত হলো, কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজে এসে মজুরি দাসে পরিণত হলো। ফলে সমাজে তখন নতুন ধরনের দ্বন্দ্ব দেখা দিলো। যে বুর্জোয়ারা ব্যক্তির মুক্তি, ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তিমালিকানা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য - এসকল জিনিস সমাজে নিয়ে এসেছিলো, তারা আর শেষ পর্যন্ত সমাজকে সেগুলো দিতে পারলো না। ব্যক্তির মুক্তি শেষ পর্যন্ত আর হলো না। কারণ বুর্জোয়ারা একটা শোষণমূলক সমাজ নিয়ে এসে ব্যক্তির শ্রমকে দাসত্বে আবদ্ধ করলো। মানুষের সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে দাসত্বের এই যে প্রভাব (যে দাসত্ব দাস সমাজ থেকে শুরু হয়েছিলো), সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত রকমের ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানা বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করা যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে। সামাজিক মালিকানা আসার পরও, অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ব্যক্তিমালিকানা না থাকলেও, মানুষের ভাবজগতে এর প্রভাব বহুদিন ধরে চলতে থাকবে। ব্যক্তির সাথে সমাজের পুরোপুরি আইডেন্টিফিকেশনের মধ্য দিয়েই প্রকৃত অর্থে ব্যক্তির মুক্তি ঘটবে। দমনের যন্ত্র হিসেবে ইতিহাসে রাষ্ট্রের ভূমিকাও নিঃশেষ হবে। সেটা আরেকটা বড় বিষয়। সেসব নিয়ে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের অপূর্ব আলোচনা আছে।

ফলে সমস্ত প্রকার দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার সামাজিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করার লড়াই যারা করবে তারা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কি রকম আন্দোলন তৈরি করবে? এদেশে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন যারা করেছে, পাকিস্তানি ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলন যারা করেছে, তারা নাটক, গান ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের উপর প্রভাব ফেলবার চেষ্টা করেছে। কারণ তারা দেখেছে যে, অতীতে ধর্মীয় ভাবাদর্শ মানুষকে যাত্রা, গান, সুর করে পুঁথি পাঠ প্রভৃতি দিয়ে প্রভাবিত করেছে। ধর্ম প্রচারকেরা পায়ে হেঁটে হেঁটে, গান গাইতে গাইতে, ভক্তির সঙ্গে, রসের সঙ্গে ধর্ম প্রচার করেছেন। এর পেছনেও ছিলো সেই সময়ের সামাজিক প্রয়োজন। ইতিহাসের বহু কথা আমরা এখানে আলোচনা করতে পারবো না, কারণ সে সময় নেই, তা না হলে আমরা দেখাতে পারতাম যে মানব ইতিহাসে ধর্ম একসময় প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে কিভাবে সমাজে এসেছে, আবার চলতে চলতে ইতিহাসের আরেকটি পর্যায়ে কিভাবে সে অবক্ষয়ী হয়ে গেলো। ধর্ম যে অবক্ষয়ী হয়ে গেলো সে ব্যাপারে একটা প্রত্যক্ষ জ্ঞান সকলের আছে, সেটা প্র্যাকটিকাল জ্ঞান (ব্যবহারিক জ্ঞান)। তা হলো

এই যে, মানুষ ধর্ম মানে না। মানে না কেন? আগে মেনেছিলো কেন? আবার কিছু না মেনে কি মানুষ মানুষ থাকতে পারবে? উচ্চতর মানবিক জীবনের দিকে যেতে পারবে? ফলে মানতে হবে। মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নীতি-আদর্শ-নৈতিকতা-অনুশাসন-বিধান ইত্যাদি ছাড়া মানুষের চলে না। জন্তু-জানুয়ারের মতো মানুষের চলেনা। মানুষ সভ্য এবং মানুষের জীবনে একটা কালেকটিভনেস (যৌথতা) আছে। একারণে তাদের যৌথভাবে চলতে হয়। এই ঐক্যবদ্ধতা তৈরি করার জন্য ধর্ম সমাজে এসেছিলো। বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে সুশৃঙ্খল অবস্থা আনার জন্য ধর্মের একটা ভূমিকা সমাজে ছিলো। আবার ধর্ম যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে সেবা করার জন্য, শক্তি দেয়ার জন্য এসেছিলো - সেই সামাজিক ব্যবস্থাটা অকার্যকরী হয়ে গেছে। তার পরবর্তীকালে পুঁজিবাদের অভ্যুত্থান ঘটেছে। পুঁজিবাদের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানা, তার রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যক্তিগত অধিকার - এই সকল প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বুর্জোয়া মানবতাবাদের জন্ম হয়েছে। ঐ যে ফ্রিডম অব চয়েসের কথা আলোচনা করলাম তার ভিত্তি তৈরি হয়েছে। এটি একথা বুঝাবার জন্য বললাম যে, যত আদর্শ সমাজে এসেছে সকল আদর্শই একটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে তার উপরিকাঠামো হিসেবেই গড়ে উঠেছে, সেটার পক্ষে মানুষকে আনার জন্য সঙ্গীত, নাটক, সাহিত্য, গল্প, কাহিনী ইত্যাদি তৈরি করেছে।

তাই যে কোনো আদর্শ, যে কোনো মূল্যবোধ প্রচার করতে, তার প্রতি আবেগ সৃষ্টি করতে সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক ইত্যাদির বিরাট ভূমিকা আছে। বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় পঞ্চকবির গানের উৎকর্ষতা ছিলো। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ, ডি এল রায় ও রজনীকান্ত - এই পঞ্চকবি। নজরুল, ডি এল রায়, অতুল প্রসাদের গান শুনলে আপনারা দেখবেন কি আবেগ, কি অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন তারা গানে। দেশের প্রতি ভালবাসা থেকে কি অনন্য সুন্দর করে ভাষা সাজিয়েছেন। কি মমতা তাদের দেশের জন্য! গানের কথা, বাঁধুনি, সুর, লয় - কি অপূর্ব! তার মধ্যে তেজ ও ভক্তি- দু'য়েরই সমন্বয় আছে। সার্থক গানে দুটোর মিলন লাগবে। এ দু'টোর আবেগ তৈরি করতে হবে।

রজনীকান্ত মূলতঃ ভক্তিমূলক গানই লিখেছেন। তবে দেশের গানও কিছু আছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তার লেখা গান 'মায়ের দেয়া মোটা কাপড়' খুবই জন-প্রিয় হয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু দেশপ্রেমের গান আছে নাড়িয়ে দেয়ার মতো। সে ব্যতীত তাঁর বেশিরভাগ গানই নিসর্গ ও আধ্যাত্মিকতার উপর। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার গানও যখন তিনি গভীরে ঢুকে করেছেন, তখন গানের মধ্যে যে প্রবল ভক্তি সৃষ্টি করছেন - সেটা লক্ষণীয়। ভক্তি কিন্তু একটা রস। উচ্চতর মানবিক রস। ভক্তি সমস্ত আদর্শের জন্যই দরকার। কেউ যখন সকল রকম সচেতনতার মধ্য দিয়ে

একটি আদর্শকে সুনির্দিষ্টরূপে বুঝে, তার প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য প্রকাশ করে, ধরতে পারে কোন্ চরিত্র এই আদর্শকে ভিত্তি করে দাঁড়ালো - তখন তার প্রতি ভালবাসা ভক্তির রূপে, রসের রূপে প্রকাশ পায়। আন্দোলনে সেটি অনেক শক্তি-সামর্থ্য তৈরি করে।

পঞ্চকবির ধারায় বাংলায় আধুনিক গান সৃষ্টি করেছেন হিমাংশু দত্ত, কমল দাশগুপ্ত, সুধীন দাশগুপ্ত প্রমুখ। শিল্পী হিসেবে সুধীর লাল চক্রবর্তী, অখিল বন্ধু ঘোষ, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, সুপ্রভা সরকার, অঞ্জলী মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা ব্যানার্জী, মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এবং পল্লীগীতিতে আব্বাস উদ্দিনসহ আরও অনেক শিল্পীর কণ্ঠে গাওয়া গানসমূহ বিখ্যাত হয়ে আছে। কিন্তু সেই সময়ের গান, তার সুরমাধুর্য, মনের আবেগকে প্রকাশ করার জন্য সুন্দর-সুললিত ভাষার প্রয়োগ - এ সবকিছুর অস্তিত্ব এখন প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। এখনকার বাংলা গান সেই ধারার যোগ্য উত্তরাধিকারী হতে পারেনি।

বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে রামপ্রসাদ বিসমিল, মুকুন্দ দাস গান লিখেছেন, গানে সুর দিয়েছেন। এদের গানে তেজোদ্দীপ্ততা ছিলো। সারা ভারতে এমন অনেকেই ছিলেন, যাদের কথা আমরা জানি না। হেমাঙ্গ বিশ্বাস মধ্যবিত্ত লোকেদের মনে জীবন সম্পর্কে সম্ভ্রমবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি সমস্ত দিক থেকে সর্বহারা শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত্ব করতে পারেননি, সেজন্য তাঁর ট্যালেন্ট (প্রতিভা), তাঁর সম্ভাবনার পরিপূর্ণ স্ফুরণ তিনি ঘটাতে পারেননি। আদর্শের বিকাশের যথার্থ নিয়মকে যথার্থভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা, তাকে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা যদি একটি বিপ্লবী পার্টির না থাকে, তবে কেউ ব্যক্তিগতভাবে কিছু করতে পারবে না। ব্যক্তিগতভাবে করে ফেলার ক্ষমতা একদিন বুর্জোয়াদের ছিলো যখন বুর্জোয়ারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তির মুক্তির জন্য লড়াই করেছিলো। এখন আর সেটা সম্ভব নয়। এটা আমি সাধারণ সত্য হিসেবে বলছি। কিন্তু কখনও কোনো জায়গায় কারও মধ্য দিয়ে কোনো ভাল জিনিস বেরিয়ে আসতেও পারে। যেহেতু মানুষের বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা এখনও অপূরিত রয়ে গেছে, তাই কখনও বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে কারও মাধ্যমে কোনো সুন্দর শিল্প সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

তাই সঙ্গীত যারা তৈরি করবে, যারা চর্চা করবে তাদের শ্রেণীসচেতন হতে হবে। অনেকে আবার প্রশ্ন করেন যে সঙ্গীতের মধ্যে আবার শ্রেণী কী? আমি বলছি, আছে। গান শুনে মানুষ ভীষণ হতাশায় ভুগতে পারে। সারাক্ষণ গুণগুণ গুণগুণ করতে করতে বিছানা ছেড়ে উঠতে সে পারে না। বিরহ-ব্যথা তাকে এমনভাবে মুহ্যমান করে দেয় যে সেটি তাকে সমস্ত মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ফলে গান বিভিন্নরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কোনো ব্যথা, কাউকে হারানোর ব্যথা এতখানি বড় হওয়া উচিত নয় যে

তা জীবনে বেঁচে থাকার, মানুষের জন্য বেঁচে থাকার, কর্তব্যের জন্য বেঁচে থাকার যে তাৎপর্য তার সবকিছুকে ধুলিসাৎ করে দেয়। গান অনেক বড় মানুষ তৈরি করতে পারে, অনেক মানুষকে বড় করতে সহায়তা করতে পারে। গান মানুষের মনুষ্যত্বকে নাড়িয়ে জাগিয়ে দিতে পারে, তাকে শৌর্যে-বীর্যে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে, তাকে ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করতে পারে আবার গান মানুষের প্রবৃত্তির শক্তিকে নাড়িয়ে দুলিয়ে তাকে ক্ষেপিয়ে তুলে কামুকে পরিণত করতে পারে, নেশাগ্রস্থ করতে পারে, বিরহ-বেদনা-বিচ্ছেদে হতাশ করে দিতে পারে। সুতরাং সংগীতের একটা রূপ সমাজ অভ্যন্তরে চলতে থাকা বুর্জোয়া-প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামে শিল্পরূপে প্রলেতারিয়েতকে সাহায্য করতে পারে আবার আরেকটা যুবশক্তিকে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহৃত হয়ে বুর্জোয়াদের সহায়তা করতে পারে। ফলে গান শুধু গান নয়, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে গানের শ্রেণী চরিত্র আছে। আপনাকে ঠিক করতে হবে শোষক-শোষিতের মধ্যে যে শ্রেণীসংগ্রাম সমাজে নিয়ত চলছে তাতে আপনি কোন পক্ষের। যখন আপনি আপনার পক্ষ ঠিক করতে পারবেন তখনই আপনি এটাও ঠিক করতে পারবেন যে কোন ধরনের গান সমাজের মধ্যে, সমাজের যুবশক্তির মধ্যে প্রসার লাভ করা উচিত। এই যে আমার কখনও এটা ভাল লাগে, কখনও ওটা ভাল লাগে, কখনও সবই ভাল লাগে, কখন যে কোনটা ভাল লাগে তা যেন আমি নিজেই বুঝতে পারি না- এসব যে আমাদের হয়, এটা হয় সমাজ সচেতনতার অভাবের কারণে। অন্ধের মতো ভাললাগা নির্ধারণ করার কারণে। মনে রাখবেন দুই শ্রেণীর যুদ্ধের বাইরে আমরা নেই। আমাদের প্রতিটি অনুভূতির মধ্যেই তা ক্রিয়া করে। তাই শ্রেণী সচেতন মানুষ হিসেবে আমাদের একটা সচেতন ভূমিকা যেমন অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে থাকে, তেমনি গানের ক্ষেত্রেও থাকতে হবে। আমরা বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্যের মধ্যে এই সমাজে অবস্থান করি বলে তার প্রাধান্যরক্ষাকারী সংগীত, ছন্দ, ধ্বনি এগুলোর দিকে আমাদের টান বেশি, কারণ এর প্রচারও বেশি এবং ছোটবেলা থেকেই শুনতে শুনতে আমাদের পছন্দের একটি ধারা তৈরি হয়েছে।

ক্লাসিক্যাল গান যখন সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স হয়ে উঠছে, সেখানেও দুই ধারা আছে। সেখানে যদি বেশি কালোয়াতি থাকে, যদি দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে, যদি মানুষকে এর মাধুর্য, এর রসবোধ, এর সূক্ষ্ম মানবিকতাতে আকর্ষিত করবার লক্ষ্যে পরিচালিত না হয়ে শুধু জটিল ফর্মের জন্ম দেয়, তখন সেই ধারাটি বিভ্রম তৈরি করে। মানুষের মধ্যে উদ্দীপনা, উৎসাহ তৈরি করে না, মানুষকে আত্মত্যাগের জন্য উজ্জীবিত করেনা। আবার আরেকটি ধারা ভারি সুন্দর হয়ে, অপরূপ হয়ে হৃদয়ের ভেতরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিসমূহ নিয়ে আসে। কারণ সূক্ষ্ম সুর ও ধ্বনি সহযোগে সংগীত মানুষের মননের সূক্ষ্ম অনুভূতিসমূহ বিকশিত করতে সহায়তা করে। যখনই কোনো মানুষের মধ্যে এই অনুভূতিগুলো সংগীত নিয়ে আসে তখন সেই মানুষ আর বিবেকবিরোধী কোনো

কাজ করতে পারে না। অন্যায় করতে পারেনা। কোনো নিষ্ঠুরতা করতে পারে না। এই সূক্ষ্ম মন ক্ল্যাসিকাল মিউজিক তৈরি করতে পারে। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ, ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, ওস্তাদ বিসমিল্লাহ্ খাঁ প্রমুখ বড় সঙ্গীতজ্ঞদের বাজনা মানুষের রুচির মানকে এই স্তরে নিয়ে যেতে পারে।

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর ক্ষেত্রে কী হয়েছিলো? প্রবল হিন্দু চিন্তাভাবনার লোকরাও আলাউদ্দীনকে বাবা বলে ডাকতো, বাবার মতোই সম্মান করতো। সে সময়ের সঙ্গীতের সকল লোক, তাঁর ছাত্র বা ছাত্র নয় - সবাই তাকে পিতা বলেই সম্বোধন করতো, পিতার মতোই ভক্তি করতো। এমন গভীর শ্রদ্ধা সঙ্গীত তৈরি করতে পারে। আর এ তৈরি করে হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি কূপমণ্ডুক বোধকে গুড়িয়ে দিতে পারে। আলাউদ্দীন হলেন এর প্রমাণ। তাঁর মেয়ে অন্নপূর্ণাকে বিয়ে দিলেন এক হিন্দু ছেলের সাথে, কোনো ধর্ম পরিবর্তন করেননি। অথচ নিজে পাঁচ বেলা নামাজী লোক। সঙ্গীতের উচ্চস্তর মানুষকে এইরকম করে দিতে পারে। সঙ্গীতের মহিমা দেখুন। আমরা সাধারণ মানুষ কি এইরকম? আমাদের প্রতিদিনের জীবনে যে আমরা হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি থাকি, আমরা কিরকম? ক'জন মুসলমান-হিন্দুর মধ্যে এরকম সম্পর্ক আছে? সঙ্গীত আলাউদ্দীনকে এই জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলো। তিনি সকলের গুরু হয়েছিলেন। তখন তিনি শুধু আর সঙ্গীতের গুরু থাকেননি; তিনি তখন তার শিষ্যদের জ্ঞানের গুরু, সংস্কৃতির গুরু, মনুষ্যত্ব বিকাশের গুরু।

তাহলে দেখতে হবে সূক্ষ্ম জিনিসটি সূক্ষ্ম অনুভূতি নিয়ে এসে সূক্ষ্ম মানবিকতা তৈরিতে সহায়তা করছে কি'না। তা না করে যদি সেটি বুদ্ধির উর্ধ্বে উঠে মানুষের মনে বিভ্রম তৈরি করে দেয় তবে বুঝতে হবে এর অন্য উদ্দেশ্য আছে। এ সমাজে কোনো সৃষ্টিই এমনি এমনি হয় না। তার সামাজিক তাৎপর্য আছে। তার মধ্যে বুর্জোয়া-প্রলেতারিয়েতের দ্বন্দ্ব আছে।

আমাদের চারণের সংগঠকদের সুর এমনভাবে তৈরি করতে হবে যা আমাদের মনে স্পন্দন তৈরি করবে, হৃদয়কে নাড়িয়ে দেবে। এখনও মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার অর্থে বহু কিছুর অভাব পূরণ এদেশে হয়নি, ব্যক্তি অধিকার প্রতিষ্ঠা ভালভাবে হয়নি। এসব কারণে এখনও আমাদের দেশে প্রেমের গান, বিচ্ছেদের গান অথবা মননের যে অভাবের দিকটা আমাদের মধ্যে আছে সেটা যদি কেউ প্রকাশ করে কোনো গান গায়, তখন ভাল লাগে। ভাল কেন লাগে? কারণ এসব জিনিস আমরা পাইনি এখনও। আমরা এমন একটা পিছিয়ে পড়া সমাজে বাস করি যে এসকল সহজ, স্বাভাবিক, মানবিক জিনিসও আমাদের আয়ত্তের মধ্যে আসেনি। আমাদের সংগীতে, নাটকে, সাহিত্যে এসকল জিনিসের কথা বলবো আবার তার সাথে সাথেই আমাদের মূল যে কথা সমষ্টির স্বার্থ, ব্যষ্টির সাথে সমষ্টির ঐক্যবদ্ধতা, দৃঢ় সংহতি - এ সব কিছুও তুলে

ধরবো। রসের সঙ্গে উপস্থাপনা করবো।

এই কাজগুলো অতীতের গণসংগীতে হয়নি। এখনকার গণসংগীতও আলগা আলগা। আলগা আলগা মানে কথাগুলো হয়তো মেহনতি মানুষের লড়াই সংগ্রামের কথাই, কিন্তু কথা-সুরে মিলে হৃদয়ে অতটা ভক্তি সৃষ্টি করে না, সমর্পণের ভাব তৈরি করে না; যতটা ভজন করে, কীর্তন করে। যদি ধর্মের লোকেরা তাদের কথা, তাদের আদর্শ এমন ভক্তিতে, এমন রসে প্রকাশ করতে পারে; তাহলে আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আদর্শ যারা ধারণ করে, মানব মুক্তির মহত্তম সংগ্রামে যারা নেতৃত্ব দেবে - সে তার সংস্কৃতির প্রকাশ এর চেয়েও সুন্দরভাবে করতে পারবে না কেন? এর চেয়েও সুন্দর শুরুতে নাও করতে পারে কারণ কখনই শুরুতে সবচেয়ে সুন্দর হয় না। কিন্তু অতীত থেকে শিখতে শিখতে একসময় অতীতকেও অতিক্রম করে ভবিষ্যতে যায় মানুষ। এই নিয়মেই চারণের কর্মীরা বিকশিত হবে।

আমরা যখন বলছি যে এ যুগে মানুষের সত্যিকারের মুক্তির পথ, সত্যিকারের বেঁচে থাকার পথ - সমাজতন্ত্রের পথ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পথ, তখন তার পরিপূরক সাংস্কৃতিক আন্দোলন তৈরি করার দিকে আমাদের এগোতে হবে। কারণ আমরা যে আদর্শের কথা বলছি সেটি সমাজে প্রতিষ্ঠিত নয়। এটি এখনও যুক্তি দিয়ে মানুষকে বোঝাতে হয়। আমরা সমাজে শ্রেণীসংগ্রামে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে যুক্তি দিয়ে মানুষের কাছে কে শত্রু, কে মিত্র এসব ধারণা নিয়ে যাই। এখন শত্রুর বিরুদ্ধে এবং মিত্রের পক্ষে মনন তৈরি করার জন্য, শত্রুকে উৎখাতের শক্তি তৈরি করার জন্য, মানুষকে শৌর্যে-বীর্যে জাগিয়ে তোলার জন্য - গানের দরকার। মানুষের মধ্যে এই চেতনা নিয়ে আসা দরকার যে, অন্যায়-অবিচার মানুষ অতীতেও মানেনি, ভবিষ্যতেও মানবে না। বর্তমানেও আমরা মানবো না। এই না মানার যে গান সেটাই চারণকে সৃষ্টি করতে হবে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের মধ্য দিয়ে বস্তুজগতের অভ্যন্তরে প্রতিমূহুর্তে যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে, সেই পরিবর্তনের নিহিত নিয়মকে জেনে, সে অনুযায়ী সমাজ অভ্যন্তরের বিকাশের নিয়ম কী, সেই নিয়ম অনুযায়ী মানুষের মননশীলতা কেমন, সেই মননশীলতার বিচিত্র যে রূপ, সেগুলোর ওপরে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারি - তা আমাদের ভাবতে হবে।

তাহলে প্রত্যক্ষভাবে আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, তেলের দাম, গ্যাসের দাম বৃদ্ধি ইত্যাদির বিরুদ্ধে কথা বলছি, কর্মসংস্থানের দাবি তুলছি, শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কথা বলছি, আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছি, আবার প্রতিটি আন্দোলনের মধ্যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্যায়-অত্যাচার দেখাচ্ছি। এসব করতে করতে যে মানুষগুলোকে আমরা আমাদের সাথে যুক্ত করতে পারছি তাদের মধ্যে আবেগ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা এগুলো গড়ে ওঠা দরকার। এক্ষেত্রে এই মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা রাখতে পারে। মানুষ যে বিষয়টি অর্থনৈতিক তত্ত্ব দিয়ে বোঝেনা, সেটি তাকে গল্পের মধ্য দিয়ে, সংগীতের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া যায়। একটা গানের মধ্য দিয়ে আমি শত্রু-মিত্রের লড়ালড়ি, তার দুঃখ ও আনন্দ দুটোই তুলে ধরতে পারি। এই প্রয়োজনগুলি বুঝে এসব সৃষ্টিশীল কাজ করার মতো উপযুক্ত ক্ষমতা চারণের কর্মীদের অর্জন করতে হবে। একদল বিপ্লবী এই গণসংগঠন পরিচালনা করবে। এই সংগঠন মানুষের হৃদয়ের উপর ক্রিয়া করবে। তাদের মননশীলতার উপর ক্রিয়া করবে। তাদের মধ্যে উচ্চ মানবিকতা তৈরি করতে, তাদের মনকে মানুষের জন্য ব্যথিত করতে, তাদের মধ্যে ভালবাসা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করবে। এটাকে বাদ দিয়ে আমরা যদি কিছু করতে যাই অর্থাৎ আমরা যদি মনে করি যে, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, নারী- এসব ক্ষেত্রে আমাদের যে সংগঠনসমূহ আছে তাদের দিয়েই আমরা বিপ্লব সম্পন্ন করে ফেলতে পারবো, সেটা আমাদের ভুল ধারণা, আমরা পারবো না। কারণ মানুষকে হৃদয় থেকে জাগিয়ে তোলার জন্য সংগীত দরকার, ভালবাসা ও আবেগ সৃষ্টি করা দরকার। তাদের বুকের মধ্যে তোলপাড় সৃষ্টি করার জন্য সংগীতের, নাটকের, সাহিত্যের ভূমিকা আছে।

আমাদের দেশে সংস্কৃতিকর্মীরা কিছু চেষ্টা করেছেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আবার রাশিয়া ও চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার দরুণ বিশ্বে এই নতুন আদর্শকে কেন্দ্র করে যে আলোড়ন তৈরি হয়, আমাদের দেশেও তার ঢেউ এসে লাগে। কিছু করার চেষ্টা তারা করেছেন কিন্তু সঠিক সর্বহারা শ্রেণীর দল না থাকার কারণে তারা সঠিকভাবে পরিচালিত হননি। সাধারণভাবে দেখা যায় সামাজিক অন্যায় দেখলে তার বিরুদ্ধে শিক্ষিত মানুষের মধ্যে প্রবল আবেগ সৃষ্টি হয়। এইসব লোকেরা সংগীতে, নাটকে, সাহিত্যে তাদের এই কষ্ট ব্যক্ত করার চেষ্টা করেন। একটি সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির এটি সঠিকরূপে পরিচালনা করা দরকার। এজন্য তার শিল্প সম্পর্কে, শৈলী সম্পর্কে, এর গুরুত্ব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা দরকার। তখন যারা শিল্পী-সাহিত্যিক তারা বুঝবে যে এসব কথা তাদের এই মানুষদের কাছ থেকে শিখতে হবে। সেসব নিয়ে ডিফারেন্সও (পার্থক্য) হতে পারে। কিন্তু তার মীমাংসা তর্ক-বিতর্কে হবে।

মানুষের সমস্যা-সংকট নিয়ে কমরেড লেনিনের সাথে গোর্কির ডিফারেন্স হয়েছিলো। অনেক প্রশ্নের সমাধান তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে হলো না। বলশেভিকদের আরও কিছু বিষয়ে তাঁর ভিন্নমত থাকায় একসময় তিনি রাশিয়া ছেড়ে দিয়ে ইতালির ক্যাপ্রিতে নির্বাসনে চলে যান। লেনিন নিজে গিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনেন। কিভাবে এই মানুষটার গুরুত্ব তিনি বুঝেছিলেন দেখুন! ফিরিয়ে এনে তাঁকে আবার সেই বিষয়গুলো মন-প্রাণ ঢেলে বোঝান। গোর্কিও পরে বিরাট ভূমিকা রেখেছিলেন সোভিয়েত

সমাজতন্ত্রের জন্য।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কেমন নতুন যুগ নিয়ে এসেছিলো দুনিয়ায়! একদিন বুর্জোয়া বিপ্লবের ঊষালগ্নে বুর্জোয়ারা অনেক কিছু সৃষ্টি করেছিলো। বুর্জোয়ারা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যাবার পর সে সমাজ হয়ে পড়ে বন্ধ্যা। এই বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে পৃথিবীতে নব সৃষ্টির জোয়ার বইয়ে দেয় সমাজতান্ত্রিক সমাজ। সোভিয়েত সাহিত্য, সংস্কৃতি লক্ষ্য করলে এর উৎকর্ষতা আমরা দেখতে পাব। বলশয় থিয়েটার ছিলো জগৎবিখ্যাত, জগৎশ্রেষ্ঠ, আনপ্যারালাল (তার সমান আর কেউ নেই)। ব্যালে ডান্সের সবচেয়ে উন্নত রূপ তাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ ঘটেছে। মায়া পিসেস্কায়া, গ্যালিনা উলানোভা প্রমুখরা ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত ব্যালেরিনা। বড় বড় অনেক মিউজিক কম্পোজারও তখন তৈরি হয়েছিলেন। ঐ দূর থেকে যখন গমগম গমগম করে, সমস্ত কিছু কাঁপিয়ে দিয়ে বিরাট বাহিনী গাইতে গাইতে, মার্চ করতে করতে এগোয় - সে কি আবেগ, কি শক্তি তৈরি করে জনগণের মধ্যে! সবচেয়ে ভাল বক্তা একটি রাজনৈতিক বক্তৃতায় যতটা আবেগ সৃষ্টি করতে পারে, কখনও কখনও একটি গান, একটি নাটক তার থেকে অনেক বেশি পারে। এজন্যই তারা একজন আরেকজনকে বুঝেন। গুণীরা একটি সামাজিক আন্দোলনে যখন সম্মিলিত হন তখন একে অপরের কদর বুঝেন। একে অন্যের প্রয়োজন বুঝেন। আমি নিজে সবকিছু করে ফেলতে পারি না- এটা রাজনৈতিক নেতৃত্বের বুঝতে হয়। গান প্রচণ্ড আকর্ষণ তৈরি করতে পারে, আবেগ তৈরি করতে পারে, উচ্চ মূল্যবোধ তৈরি করতে পারে, হৃদয়ের মধ্যে স্পন্দন তৈরি করতে পারে। এই মাধ্যমগুলো মানুষের আবেগের গভীরে ঢুকে তার উপর ক্রিয়া করে আবেগের সেই ধারাটাকেই বদলে দিতে পারে। যাকে আমরা 'প্যাটার্ন অব ইমোশন' বলি।

নাটকও খুব গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। নাটকে আমাদের দেশের চিত্র এঁকে দেখানো যায়। ব্যক্তিবাদ ঘর ধ্বংস করে দিচ্ছে, পরিবার নষ্ট করে দিচ্ছে। প্রতিদিন আপনি কাঁদছেন, পুড়ছেন এই দুঃখের জন্য। অথচ যে পথে গেলে এর সমাধান হবে সেই পথে হাঁটছেন না। মনে করছেন নিজে নিজে সমাধান করে ফেলবেন, পারবেন না। মনে করছেন নিজের পরিবারটাকে ঠিক করে ফেলবেন, পারবেন না। পারছেনও না। কিছুই আপনার পরিকল্পনামতো হচ্ছে না। প্রতিদিনই আপনি ব্যর্থ হচ্ছেন। জটিল থেকে জটিলতর অবস্থার মধ্যে পড়ছেন। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটাই দেখুন। এতো মধুর স্বপ্ন নিয়ে এলো যে সম্পর্ক - সে এই সময়ে যে সকল সমস্যার জন্ম দিচ্ছে তার সমাধান কি করতে পারছেন? একবার সন্দেহ তৈরি হতে শুরু করলে মাধুর্যের একেবারে দফারফা হয়ে যাচ্ছে। এই মানুষগুলোকে আমরা জীবনের সন্ধান নতুনরূপে দিতে চাই। শেখাতে চাই যে, বাঁচার অন্য মানে আছে। শুধু আপনি যে একা একা বেঁচে আছেন, এইজন্যই এই দুঃখ। পুঁজিবাদই দুঃখের কারণ, ঠিক। কিন্তু আপনি তার ভিকটিম, তার শিকার, তার

কাছে পরাস্ত, তার পদানত। সে কারণে আপনার মধ্যে এতো দুঃখ। আপনি প্রতিবাদী হোন, জ্বলে উঠুন। দেখবেন আপনার কত শক্তি!

নব জীবনের এই সংবাদ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে চারণের এই বাহিনী। কিন্তু যারা এই ক্ষেত্রে কাজ করবে তারা নিজেদের খেয়ালখুশি মতো করতে গেলে পারবে না। কারণ এমন একটা যুগে আমরা বাস করি যে যুগে মানুষের মধ্যে ব্যক্তিবাদ প্রবল আকারে বিরাজ করে। আমাদের মধ্যেও ব্যক্তিবাদী ঝোঁক প্রচণ্ড। আমাদের অনেকেরই নিজের পছন্দমতো কাজ করতে ভাল লাগে। নিজের পছন্দমতো কেউ সমাজবিকাশের প্রয়োজনের সবচেয়ে ভাল জিনিসটি সৃষ্টি করবেন এবং করেই যাবেন, সে যুগ নেই। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তির মুক্তির যুগে, যখন ব্যক্তি নিবেদিতপ্রাণ ছিলো সকল সৃষ্টির জন্যে - সে যুগে তা সম্ভব ছিলো। সেই মানুষেরা এখন ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। এখন আর ব্যক্তিগতভাবে সেই সৃষ্টি সম্ভব নয়।

এখন ছেলেমেয়েরা যে ভালবাসার চর্চা করে তা নেহাৎই ব্যক্তিগত কারণে করে। কিন্তু ভালাবাসা এসেছিলোই সামাজিক অন্যায়-অবিচারকে কেন্দ্র করে লড়াইয়ের প্রয়োজনে। এখন ভালবাসা শুধু ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক হওয়ার কারণে তারা ঠিকভাবে ভালবাসতেও জানে না। ডায়লগ জানে না, ডিসকাশন জানে না, উইট জানে না, হিউমার জানে না- তাহলে কিভাবে ভালবাসা হয়? আবার শুধু দুজনে-দুজনে কি এসব হয়? এগুলোর চর্চা বন্ধুবান্ধবসহ সকলকে নিয়ে করতে হয়। তখন সবাই এই সম্পর্কের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে। এখন ছেলেমেয়েরা সম্পর্কের চর্চা শুরু করলেই আড়ালে যেতে চায়। অন্ধকারে যায়, ঝোঁপে যায়। কেন? কারণ তাদের ভালবাসায় কোনো শিল্প সৃষ্টি নেই, ডায়লগ নেই, সৌন্দর্য নেই, মাধুর্য নেই।

আমার কাছ থেকে তুমি কোনো মধুর বচন, মানবিক কথা, হৃদয়বৃত্তির কথা, ত্যাগের কথা, লড়াইয়ের কথা - কি শুনলে? আমরা কি চর্চা করলাম? যদি না করি তাহলে আমাদের ভালবাসা সুন্দর হয়ে উঠবে কি করে? আমাদের ভালবাসা উচ্চ মানবিকতা নিয়ে দাঁড়াবে কি করে? শিল্পরূপে প্রকাশ পাবে কি করে? পাবে না। আর পায় না বলেই আমাদের ভালবাসা আড়ালে যেতে চায়। ভালবাসা আড়ালে যাওয়ার বস্তু নয়। দুজন মানুষের সম্পর্কের পরিণতিতে যখন তারা মিলনে যায় তখন তাদের একটা আব্রুর দরকার হয়। কিন্তু যখন তর্ক-বিতর্ক করছে, কথাবার্তা বলছে তখন তো বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তা করবে। দুজনের সম্পর্ক, হাসিঠাট্টা দেখে অন্যেরা খিলখিল করে হাসবে। এই তো সৌন্দর্য।

আমাদের আগের যুগেও দেখুন। আমাদের ভাবীরা দেবর, ননদ এদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করতো না? তাহলে দেখুন রসের চর্চা একসঙ্গে থাকা লোকেদের মধ্যেও ছিলো। এখনও রসের চর্চা একসঙ্গে থাকা লোকেদের মধ্যে যদি না থাকে, বিচ্ছিন্ন দুজন মানুষ

যদি রসের চর্চা করে তাহলে কি করবে? শুধু ব্যক্তিগত, শরীরগত, প্রবৃত্তিগত কিছু জিনিসের চর্চা করবে। কিন্তু আনন্দ তৈরি করতে পারবে না। সত্যিকারের আনন্দ, নিঃস্বার্থ আনন্দ তৈরি করতে পারবে না।

যারা বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত আছেন তারা যখন ভালবাসবেন তখন ভাববেন যে আমাদের ভালবাসা একটি শিল্প। সেটি অন্যরা দেখে আনন্দ পাবে, অনুপ্রাণিত হবে। আমরা তাদেরকে সকল সৌন্দর্যের অংশীদার করতে পারি। সর্বহারা শ্রেণীর সমষ্টির স্বার্থের ভিত্তিতে যে ভালবাসা, সেটি ব্যক্তিস্বার্থকে কেন্দ্র করে যে ভালবাসা এসেছিলো তার চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। সেটার প্রকাশ তাই এই রূপেই হতে হবে। মন আমার এরকম হতে হবে যে, আমার কমরেডদের ছাড়া শুধু একজন মানুষের সাথে আমার চলতে ফিরতেও ভাল লাগে না। এরকমই আমার মন। কখনই চলতে ফিরতে ভাল লাগে না বা চলাফেরা করা যাবে না- আমি এরকম জবরদস্তি করছি না। কিন্তু বেশি-রভাগ সময়েই আমরা একসঙ্গে চলি, একসঙ্গে সিনেমা দেখি, থিয়েটার দেখতে যাই, একসঙ্গে গল্প করি, হাঁটি, একসঙ্গে লড়াই করি। কিন্তু যদি শুধু দুজনে-দুজনে সব করি তাহলে কিছুদিন বাদে সব ভোঁতা হয়ে যাবে, একঘেয়ে হয়ে যাবে, অকার্যকরী হয়ে যাবে। সত্যিকারের আনন্দ আর পাওয়া যাবে না। একঘেয়েমির মধ্যে তো কোনো আনন্দ নেই। বিপ্লবীদের তো সৃজনশীল মানুষ থাকতে হবে।

এই বিষয়গুলি নাটকের মধ্যে তুলে ধরতে হবে। একটি ছেলে, একটি মেয়ের ডায়লগের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে। তাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক, উইট-হিউমার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে রস সৃষ্টি করে বিষয়টিকে উপস্থাপন করতে হবে। এর আকর্ষণ মানুষ অনুভব করবে আবার বুঝবে ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগের উপাদান জড়িয়ে ছিলো বলেই এই চরিত্রগুলো এমন হতে পারলো।

বাংলা সাহিত্যে এইসকল ব্যথা-বেদনা, সামাজিক যন্ত্রণা ধারণ করে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়। তিনি তাঁর গল্পে, উপন্যাসে অসাধারণ সব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এথিক্যাল মাদারহুডের ধারণা চমৎকার করে তাঁর মেজদিদি, বিন্দুর ছেলে, মামলার ফল, অনুরাধা, রামের সুমতি - এই লেখাগুলোতে নিয়ে এসেছেন। এই 'এথিক্যাল মা' হওয়ার জন্য উচ্চশিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, কিন্তু উচ্চ মূল্যবোধের প্রয়োজন। 'মামলার ফল' পড়লে আপনারা দেখবেন, কত সাধারণ গরীব ঘরের এক চাষী বউ গঙ্গামণি। কি নেই তাদের মধ্যে? সাধারণ গ্রামীণ পরিবারগুলোর মতই তার স্বামী ও দেবর - দুইভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে, সামান্য বাঁশপাতা নিয়ে তাদের মধ্যে কাটাকাটি লেগে যায়। গঙ্গামণিরও তার জায়ের সাথেও এমনই সম্বন্ধ। কিন্তু তার দেবরের প্রথম পক্ষের ছেলে গয়াকে সে খুব ভালবাসে। গয়াও তাকে মায়ের মতোই দেখে, কারণ তার মা মারা যাবার পর এই জ্যাঠাইমার কাছেই তার যত দাবি-দাওয়া

সে করতে পারে। সৎ মা তাকে পছন্দ করে না। সেই গয়া জ্যাঠাইমার উপর রাগ করে তার ঘরের হাড়ি-পাতিল সব ভেঙ্গে ফেলল। এই সুযোগ পেয়ে গঙ্গামণির স্বামী শিবু ও ভাই পাঁচু মিলে গয়ার নামে থানায় মামলা করে দিল। উদ্দেশ্য তার ভাইকে শায়েস্তা করা। গঙ্গামণিও প্রথমদিকে রাগে এতে সায় দিয়েছিলো কারণ এর পরিণতি সম্পর্কে তার ধারণা ছিল না। পুলিশ যখন সত্যিই গয়াকে ধরতে আসে তখন সে বুঝতে পারে সে কি করেছে। এর পরের ঘটনা অবাক করার মতো। দেখা গেলো গয়া পুলিশের ভয়ে পালিয়েছে, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এরপর দেখা গেলো গঙ্গামণিকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একসময় গয়ার খোঁজ পেয়ে গঙ্গামণির স্বামী ও ভাই গিয়ে দেখেন গঙ্গামণি গয়াকে আদর করে খাওয়াচ্ছে। তার স্বামীর সাতদিন ধরে নাওয়া-খাওয়া নেই। গয়া তার নিজের ছেলেও নয়। কিন্তু মা মরা একটা ছেলের ভার নিয়ে সে মা হয়েছে, তাকে সে কোনো কারণেই ছেড়ে দিতে পারে না। তাহলে তার মাতৃত্ব থাকে না। তার বড়ত্ব থাকে না। সেজন্য সে গোটা সংসার ফেলে দিয়ে ছেলের কাছে চলে এলো। স্বামীকে ছেড়ে এলো। এ এক অপূর্ব ব্যাপার। এখানে তার কিছুই পাওয়ার নেই, কিন্তু সংসারে ছিলো। সেটাই সে তুচ্ছ করে এলো। কেনো? মায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য, মাতৃত্বের যে নৈতিকতা আবার নৈতিক যে মাতৃত্ব- তাকে রক্ষার জন্য।

একই রকম মা আমরা দেখি 'মেজদিদি'র হেমাঙ্গিনী চরিত্রে। সেও মাতৃত্ব রক্ষার জন্য স্বামীকে এমনকি নিজের ছেলে-মেয়েকে পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলো। যার জন্য বেরিয়েছিলো তার নাম কেষ্ট, সে একটি অনাথ ছেলে। তার জায়ের সৎ ভাই। ছেলেটির দুঃখ দেখে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে আসার জন্য স্বামীকে অনুরোধ জানিয়ে হেমাঙ্গিনী বলেছিলো, 'আমি নিয়ে এলে সংসারে কেউ তাকে আটকে রাখতে পারে? আমার দুটি সন্তান ছিলো, কাল থেকে তিনটি হয়েছে, আমি কেষ্টর মা'। 'বিন্দুর ছেলে' তে দেখবেন বড় বউ বিন্দুকে বলছে, 'তোর অমন মেঘের মতো চুল ছোট বউ, তুই খোঁপা বাঁধিস না কেন'? তখন বিন্দু বলছে, 'ছেলে বড় হয়েছে দিদি। ও হঠাৎ খোঁপা দেখলে কি মনে করবে। এটা ভাল হয় না'। দেখুন দায়বদ্ধতার গভীরতা কেমন একজন মায়ের। কি রকম সচেতনতা। পাছে ছেলে ভাবে মা কোন শৌখিনতা করছে এজন্য খোপা বাঁধতো না। একটা শখ এলো, অমনি আর কোনো দিকে তাকালাম না - এই ধরনেরই নয়। 'রামের সুমতি' তে একই বিষয় দেখবেন। দেবর রাম, যাকে নারায়ণী ছেলের মতো বড় করেছেন, তাকে কাছে রাখার জন্য নিজের মাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেন।

এই চরিত্রগুলো আপনারা শরৎ সাহিত্য পড়লে দেখতে পাবেন। বুর্জোয়া মানবতাবাদ এথিক্যাল মাদারহুডের কনসেপ্ট এনেছে কিন্তু শরৎচন্দ্র এগুলো চরিত্র তৈরি করে করে দেখিয়েছেন। সামন্ত মা ভেঙ্গে দিয়ে আধুনিক মা কেমন হবে তা দেখিয়েছেন। সে

মা হওয়ার জন্যে বি.এ, এম.এ পাশ করা লাগে না। মানুষের মধ্যে এমন মায়ের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছেন। বলতে চেয়েছেন, দেখতো, তোমাদের ঘরে ঘরে এমন মায়েরা আছে কি'না? এ থাকার দরকার কি'না? কমরেড শিবদাস ঘোষ তার বক্তব্যে বলেছেন, যারা কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে এথিকস (নৈতিকতা) পড়ান তারা এসকল বিষয় জানেন। কিন্তু চরিত্রে তা ধারণ করেন না। সাধারণ সরল গ্রামীণ চরিত্রগুলোর মধ্যে শরৎচন্দ্র এ জিনিস এঁকে দেখিয়ে দিলেন তাদের - যারা পড়ায়, পড়ে; কিন্তু এ জিনিসের রূপ কি তা জানে না, এর সৌন্দর্য কি তা ধরতে পারে না।

আমাদের দেশে শরৎসাহিত্য নিয়ে গভীর চর্চা হওয়া উচিত। আপনাদের ঘরে ঘরে কি এমন মা আছে? এমন মা দেখেছেন কখনও? এ মা যে উন্নত মা এটা বুঝতে পারেন, কিন্তু এই মা তো দেখেননি। এদেশের ঘরে ঘরে তো এমন মা নেই। আবার জীবন কিভাবে চলবে তা নিয়েই এতো ফেঁসে গেছেন যে এসব কথা ভাবারই আপনার ফুসরৎ নেই। না ভাবলে কি হয়? নিজে মনে করছেন আমার মতো সৎ লোক দুনিয়াতে নেই, আমার মায়ের মতো ভাল মাও পৃথিবীতে নেই। আবার পৃথিবীর খবরও ভাল করে জানেন না। এসব করে শেষ পর্যন্ত কি হচ্ছে? নিজের মায়ের সম্মানটা পর্যন্তও আর ধরে রাখতে পারছেন না। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মায়েদের বেইজ্জতি হচ্ছে। যে ধরনের সম্মান সামাজিক পরিবেশে পেলে এরকম মাতৃত্বের বিকাশ ঘটে, বিন্দু-নারায়ণীদের মতো মায়েরা জন্মায়, সেই সামাজিক পরিবেশও তো আমাদের দেশে নেই। সেটা পুরোপুরি অনুপস্থিত। শরৎ সাহিত্যের চর্চা হলে এইরকম মায়ের অভাববোধ সমাজে জন্ম নেবে।

এই অভাববোধ মানুষের মনন বিকাশের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কত অভাবের মধ্যেই না আমাদের বসবাস। অর্থনৈতিক অভাব যদি বাদও দেই, শিক্ষার অভাব, রুচির অভাব, সংস্কৃতির অভাব, ভালবাসার অভাব, মূল্যবোধ-মানবিকতার অভাব- এইরকম সমস্ত অভাব এ সমাজে বিদ্যমান। গোটা দেশটাই তো অভাবী। এই অভাব যদি আমরা বুঝতে না পারি অর্থাৎ এমন যদি হয় যে অভাব আছে কিন্তু অভাববোধ আমাদের নেই - তাহলে আমাদের দুর্গতি কেউ আটকাতে পারবে না। দুটো শার্ট গায়ে দেয়ার জন্য আছে আর নুন দিয়ে দুবেলা দুটো ভাত খেতে পারি-এই ব্যস। এই নিয়ে তিনবেলা তুড়ি মেরে যদি বলতে থাকি যে বেশ ভাল আছি, খুব ভাল আছি। সাহেব মাঝে মাঝে দু'তিন ঘা দেয় বটে তবে প্রতিদিন মারেনা - বাহ্! এই স্তরের অভাববোধ নিয়ে কোনো জাতি দাঁড়াতে পারে?

পারে না। তাই সংস্কৃতির এ মাধ্যমগুলো দিয়ে এ দেশের মানুষের মনে অভাববোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। দেখাতে হবে, কত স্বপ্ন নিয়ে এ জাতি স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছিলো। কিছুই সে পেল না। পেল না কেনো? এই অভাবের জন্য কে দায়ী? দায়ী

পুঁজিবাদ। স্বাধীনতার পর দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুঁজিবাদই সকল অভাবের জন্মদাতা। এই পুঁজিবাদ রক্ষা করে আজকের দিনে মনুষ্যত্ব রক্ষা করাও যাবেনা। ব্যক্তিগত মানুষ নিজেদের মনের উদারতা, বড়ত্ব, মহত্ব, ক্ষমা, দয়া ইত্যাদি সুকুমার বৃত্তিসমূহও রক্ষা করতে পারবেন না। যারা এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে ভাঙবার জন্য জীবনপাত করছে তারা পারবে। কোনো লড়াই না করে ঘরে বসে থাকা লোকেরা পারবেন না। গৃহীরা পারবেন না।

এই অভাববোধ থেকে মানুষ সৃষ্টি করতে পারে, যেমন বিপ্লবীরা করবে। সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম করতে গিয়ে সে প্রতিনিয়ত ভালবাসা, স্নেহ, মমতা সবই তৈরি করবে। তা না হলে অভাববোধ মানুষকে বিকৃতির দিকে নিয়ে যায়। সমাজে যে এত বিকৃতি দেখেন, যদিও সবই আমাদের সামনে আসে না, পরিবারগুলোতে হরদম অনেক ঘটনাই ঘটছে- এসকল বিকৃতির কারণ কী? এর কারণ অভাববোধ। মানুষের সকল অভাব মেটাবার বাস্তব পরিস্থিতি সমাজে নেই সেটা বুঝে, কিন্তু সেই পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য লড়াই করতে পারে না - সেই পরাজিত, পরাস্ত মানুষেরা তাদের গ্লানি থেকে বিকৃতির দিকে যায়। লুকিয়ে পেতে চায়। বিপ্লবী রাজনীতিতে যারা যুক্ত হয়েছেন তারাও মনে রাখবেন, পার্টিতে যুক্ত হলেন মানেই চরিত্রের সার্টিফিকেট পেয়ে গেলেন ব্যাপারটা এমন নয়। যারা আনুষ্ঠানিক বিপ্লবী, লোকদেখানো বিপ্লবী, কিন্তু সৃজনশীল বিপ্লবী না; মানুষকে গড়ে তোলা, মানুষকে পাল্টানো এই সংগ্রামগুলো যথার্থ করছে না, তাদের মধ্যেও পুরনো সমাজের নানা প্রতিযোগীতা, প্রতিদ্বন্দ্বীতার মনোভাব, ক্ষুদ্রতা, নীচতা সবই আসবে। আসবেই। এটি আপনি আপনার সৎ ইচ্ছা দিয়ে আটকাতে পারবেন না। 'ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি' এর ভূমিকায় মার্কস বলেছিলেন, "It is not men's consciousness that determines their existance, but their social existence that determines consciousness." অর্থাৎ "মানুষের চেতনা তার অস্তিত্বকে নির্ধারণ করে না, বরং তার সামাজিক অস্তিত্ব তার চেতনাকে নির্ধারণ করে।"

যে কথাটা বলছিলাম, মানুষের মনোজগতের পরিবর্তনের এই কাজটি সঙ্গীত, নাটক, সাহিত্যে প্রকাশ করতে গেলে যেসকল মানুষের মধ্যে এসব গুণ আছে তাদেরকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। এটা সোজা নয়। কারণ এ যুগে শিল্প-সাহিত্যের সাথে যুক্ত মানুষদের প্রবল ব্যক্তিবাদী ঝোঁক আছে, ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কে ভুল ধারণা আছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা মানব সমাজের বিশেষ একটি সামাজিক স্তরকে আরও উচ্চতর সামাজিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিলো। যখন সেটা অকার্যকরী হয়ে গেলো তখন তাকে কেন্দ্র করে যে আবেগ, যে মানবিক সম্পর্ক তা সবই পুরনো হয়ে গেছে। তাই সেটা দিয়ে কিছু করা যাবে না। আবার নতুনরূপে মানবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। সেটা শিল্প সাহিত্যের মধ্য দিয়ে, নাটকের মধ্য দিয়ে আনতে হবে।

কেমন যুগে আমরা আছি ভাবুন? এখনকার ফিল্মও দুর্বোধ্য, কিছু টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট (কারিগরি উন্নতি) হয়তো আছে, ভালই আছে। কিন্তু কন্টেন্ট (বিষয়বস্তু) হয় দুর্বল, নয়তো দুর্বোধ্য। ক্লাসিক্যাল মিউজিকের ক্ষেত্রেও একই কাণ্ড ঘটেছিলো। একটা সময় ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, জারি, সারি, ছাদ পেটার গানসহ যতরকমের কর্মসঙ্গীত আছে সেগুলো প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ও নিজেদের শ্রম লাঘব করতে মানুষকে সহায়তা করেছে। তারপরে এক সময়ে এসে গান হয়ে গেলো সামন্ত সমাজের কোর্ট মিউজিক। তখন সে সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। দরবারের সঙ্গীত হওয়ার পরে সেখানে রাজা-রাজরারা সুরের এবং ফর্মের অনেক চর্চা করেছেন। তখনও সামন্ত সমাজ অবক্ষয়ী হয়নি। কিন্তু ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে সে সুর হয়ে পড়লো বিমূর্ত। মানুষের বুদ্ধি এবং চর্চার বাইরের বস্তু। কিন্তু বুর্জোয়া ব্যবস্থা যখন আসতে শুরু করলো তখন ক্ল্যাসিকাল মিউজিকও ভাঙ্গতে শুরু করলো। গানের খানিকটা মানুষের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন আসলো। তখন খেয়াল, ঠুমরি, গজল ইত্যাদি ফর্মের জন্ম হলো। সাধারণভাবে আমাদের দেশে ভজন-কীর্তন তো ছিলই। ফলে হরিদাস স্বামী, তানসেনদের সময়ের ক্ল্যাসিকাল মিউজিকের সেই পুরনো ফর্ম আর নেই। তাকে সহজ হতে হয়েছে, বোধগম্য হতে হয়েছে। কিন্তু বোধগম্য হলেই কোনো কিছু ভাল হয়ে যায় না। বোধের কোন দিকটিকে সে বিকশিত করছে তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেটি মানুষের নিম্নগামী বোধকে উস্কে দিচ্ছে, নাকি যে বোধ মানুষকে আরও মানবিক করে তুলতে সহায়তা করে সে বোধকে জাগিয়ে তুলছে - বিচারটা এভাবে করতে হবে। প্রকৃত সঙ্গীত মানুষকে আরও স্পর্শকাতর করে, অনুভূতিপ্রবণ করে, মানুষের মধ্যে উচ্চস্তরের মমতা সৃষ্টি করে। একজন মানুষের ভেতরে সেগুলো জন্ম নিলে সেগুলি কি শুধু তার ব্যক্তিগত কাজেই লাগে? না। এতসব গুণাবলীর চর্চা কেউ শুধু তার পরিবারের মধ্যে করতে পারে না। সেগুলি তখন সাধারণ মানুষের জন্যে, তাদের ভালবাসার জন্যে, তাদের পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে উন্নত অবস্থায় নিয়ে যাবার জন্যে কাজে লাগে। একজন রুচিসম্পন্ন, অনুভূতিসম্পন্ন লোকের গল্প করার জন্য বন্ধুকেও তো তৈরি করে নিতে হয়। এভাবে সে যখন মানুষের সংস্পর্শে আসে তখন মানুষও উন্নত ও সূক্ষ্ম রুচি-সংস্কৃতির স্বাদ বুঝতে পারে।

আবার এর মানে এই নয় যে জটিলতম, সূক্ষতম জিনিস মানুষ ধরতে পারবে না। পারবে। জটিলতম, সূক্ষতম জিনিসের এফেক্ট এমন হবে যে, মানুষের মধ্যে সে এমন সুকোমল মন তৈরি করবে, এত সূক্ষ্ম রুচির মানুষ তৈরি করবে যে রুচির এই মানের কারণে সে কখনও কোনো নিচু কাজ করতে পারবে না।

কিন্তু সেরকম করে কিছু এদেশে হচ্ছে না। দুনিয়ার সব জায়গায়ই একই অবস্থা।

ইউরোপ-আমেরিকায় সবই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। নর-নারীর প্রেমকে অল্প সময়ের মধ্যেই স্থূল যে চর্চা অর্থাৎ প্রবৃত্তিগত চর্চার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ডিকেন্স, থ্যাকারে, জনসন, বার্নার্ড শ - এদের লেখায় যে ডায়লগের সৌন্দর্য ছিলো তা এখন নেই।

বার্নার্ড শ'র 'ম্যান এন্ড সুপারম্যান' পড়লে দেখবেন, একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে আর এক প্রখর বুদ্ধিমান ছেলে দুজনে ডায়লগ করছে। তারা পরস্পরকে ভালবাসে, কিন্তু কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না। ডায়লগে খেলছে। কথায় খেলছে। আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করছে। আর তুমি মূহুর্তের মধ্যেই হাত ধরে ফেলছো। তুমি কি ভালবাসা সৃষ্টি করবে, তুমি তো কিছু বুঝতেই দিচ্ছ না। কোনো শিল্পরূপই তোমার নেই।

মাদাম কুরি সিনেমায় আপনারা দেখবেন, মাদাম কুরি তখনও মাদাম কুরি হয়নি। সে তখনও মেরি। খুবই গরীব ঘরের একটি মেয়ে। পোল্যান্ড থেকে সে সোবর্নে পড়তে এসেছে। না খেয়ে খেয়ে কাজ করে। একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো। মাস্টাররা তাকে তুললেন, খাওয়ালেন। তারা দেখলেন এই মেয়েটিকে যে কাজ দেয়া হয় সবই সে নিপুণভাবে করে। তার মনোযোগ, তার একাগ্রতা দেখে মাস্টাররা তাকে ল্যাবে কাজ করার সুযোগ দিলেন। সেই ল্যাবে ছিলেন পিয়েরে কুরি। তিনি মেরকে দেখে একটু বিরক্ত। একটা মেয়ে এসে ঢুকেছে ল্যাবে। সে এখন অনেক কিছু বুঝবে না, জিজ্ঞাসা করবে, বিরক্ত করবে। পিয়েরের চরিত্রও শিক্ষা নেবার মতো। মেয়ে দেখলেই অমনি প্রেম এসে যাওয়ার প্রকৃতির লোক নয়। মেরী তো খুব সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু পিয়েরে নির্লিপ্ত। দুজনের কারও মাথায়ই এসকল স্বার্থকেন্দ্রিক চিন্তা ছিল না।

এক, দুই, তিনদিন পরে পিয়েরে দেখলেন মেয়েটি তাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এমন গভীর মনোযোগের সাথে সে কাজ করে যে তাকায়ও না। খাওয়ারও খেয়াল থাকে না। রাত হয়ে যায়, উঠতে চায় না। একদিন এমন দেরি দেখে পিয়েরে জিজ্ঞেস করলেন, মাদাম মোয়াজ্জেল, তুমি কি বাড়ি যাবে না? মেরির হুঁশ হলো। বললো, হ্যাঁ, যাব। তখন পিয়েরে তাকে বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে দিলেন। এভাবে চলতে চলতে একদিন তারা আবিষ্কার করলো দুজনেই গভীরভাবে মগ্ন। বিজ্ঞানে মগ্ন। বিজ্ঞানের প্রতি মগ্নতা থেকেই তাদের মধ্যে ভালবাসার সৃষ্টি হলো। তার পরে কি তারা কখনও হাত ধরেনি? আমি কি হাত ধরার বিরোধীতা করছি? তুমি যে কোনো কিছু গড়ে ওঠার আগেই ঝটপট ঝটপট কাজ সেরে ফেরলে চাইছো, এরকম স্থূল বুদ্ধির যুবক-যুবতীতে যে দেশ ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, আমি তার বিরোধীতা করছি। কারণ বুর্জোয়ারা রুচিসম্পন্ন, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়ে রাখতে চায় না। তারা সেই স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়ে চায় যাদের দিয়ে তারা কাজ সারতে পারবে। তাই তারা মানুষের রুচির জায়গা ধ্বংস করে দিতে চায়।

কমরেড, আমরা বুর্জোয়াদের এই চক্রান্ত রুখে দিতে চাই। রুচিসম্পন্ন মানুষ তৈরি

করতে চাই। পার্টি তাই এই ফ্রন্টকে খুব গুরুত্বের সাথে দেখছে। এটা পার্টির শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। ধরুন আমরা অন্য দু'একটি ফ্রন্টে দুর্বল। কিন্তু এই ফ্রন্টে দারুণ একটা কিছু করলাম। সেটা দলের সম্মান, আকর্ষণ অনেক বাড়িয়ে দেবে। আমাদের ছাত্ররা, শ্রমিকরা, কৃষকরা, নারীরা যে লড়াই করছে - এই লড়াইয়ের ছাপ মানুষের মধ্যে পড়ে, পড়ছেও - চারণ এ বিষয়গুলোকে নিয়ে গান বানাতে পারে, নাটক তৈরি করতে পারে। আন্দোলন সবসময় একই মাত্রায় থাকে না, কোথাও কোনো আন্দোলন যখন একটু ঝিমিয়ে পড়ছে - তখন তাদেরকে জাগিয়ে তোলার জন্য চারণ কাজ করতে পারে।

আমি আর কথা বাড়াবো না। আমি চারণের কর্মী-সংগঠকদের সবশেষে এই কথাই বলতে চাই যে, আপনারা একগুচ্ছ সম্ভাবনাময় নবীন মানুষেরা এখানে এসেছেন এবং দলকে আপনারা বিভিন্নভাবে অনেক সাহায্য করতে পারেন। তার কিছু দিক আমি আজ বললাম। অনেক সম্ভাবনার দিক এবং রুচি-সংস্কৃতি সংক্রান্ত অনেক কথা এখনও বাকি আছে। পরবর্তীতে আবারও বসা হলে বলবো। আর একটা দিক হলো এই যে, আমরা যারা বিপ্লবী রাজনীতি করি তাদের সম্পর্কে আমি এই কথাগুলো বললাম এটা ঠিক। কিন্তু চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র যেহেতু একটি গণসংগঠন তাই এখানে আমাদের দলের সঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত নয় এমন মানুষেরাও আসতে পারেন। তারা যদি এই রুচি-সংস্কৃতির কথাগুলোকে সমর্থন করে তার পক্ষে ক্রিয়া করতে আগ্রহী হন, মানুষের পক্ষে দাঁড়াতে আগ্রহী হন - তবে তারা এই সংগঠনের সভ্য হতে পারেন। আমাদের সর্বপ্রকার চেষ্টা থাকবে কিভাবে তাদের দলের সাথে আরও একাত্ম করা যায়।

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

২২/১ তোপখানা রোড, শিশু কল্যাণ পরিষদ ভবন (৬ষ্ঠ তলা),
ঢাকা ১০০০ থেকে প্রকাশিত। যোগাযোগ : ০১৭১৫-৮০৮০৪৭
ই-মেইল : charon.spbm.1984@gmail.com